মুক্তকথা

সন্তানের চোখে অধ্যাপক গোলাম আযম

সালমান আযামী

আমি অধ্যাপক গোলাম আয়েমর ছয় ছেলের মধ্যে কনিষ্ঠতম। সবার ছোট হিসেবে যে আদর পাওয়ার কথা, তা পুরোটাই পেয়েছি, বিশেষ করে আমার দাদা, আব্বা ও বড ভাইয়ার কাছ থেকে। দাদাকে হারিয়েছি খুব ছোটবেলায়, আর বড ভাইয়া বিদেশে চলে যাওয়ায় তার আদরও বেশি দিন পাইনি। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ১৯৭৬ সালে ইংল্যান্ড যাওয়া পর্যন্ত সাডে চার বছর আব্বাকেও কাছে পাইনি। ১৯৭৬ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৯৫ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত পুরো সময়টা আব্বার সাথে কাটানোর সৌভাগ্য হয়েছে, এক টেবিলে খাওয়ার সুযোগ হয়েছে। মাঝে কয়েকটি বছর আলীগড মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পডার জন্য ভারতে থাকলেও প্রতি বছর প্রায় তিন মাস দেশে কাটানোয় আব্বা-আম্মা থেকে দূরে থেকেছি বলে মনেই হয়নি।

আব্বার সান্নিধ্য আমার কোনো ভাই এত বেশি পাননি।

আদর্শবান বাবা হিসেবে তিনি দাযত্বি পালনে একটুও শিথিলতা প্রদর্শন করেননি। পাঁচ বছর বয়স থেকে দাদা আমাকে নামাজে অভ্যস্ত করেন। এর পর থেকে কোনো দিন নামাজ ছাডা তো দূরের কথা, জামাতে নামাজ না পডলে আব্বার কঠোর বকুনি শুনতে হতো। প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পর আব্বা মসজিদের চার দিকে তাকিয়ে দেখতেন, তার ছেলেরা জামাতে হাজির হয়েছে কি না। ঘুম হতে ওঠা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন কাজের জন্য যে দোয়া রাসূল সা: শিখিয়ে গেছেন, তা আব্বা আমাকে শুধু শিখিয়েই ক্ষান্ত হননি, নিশ্চিত করতেন সেগুলো সময়মতো পডছি কি না। ১৯৭৭ সালে মাত্র ১১ বছর বয়সে আব্বা-আম্মার সাথে পবিত্র হজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। আরাফাতের ময়দানে আব্বার সাথে হাত মিলিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে যে দোয়া করেছিলাম ও চোখের পানি ফেলেছিলাম, তা মানসপটে এখনো ভেসে ওঠে। দোয়ার পাশাপাশি নিয়মিত কুরআন পডা ও মুখস' করার ব্যাপারে তিনি সব সময় খোঁজখবর নিতেন।

মানুষ হিসেবে যেসব মৌলিক গুণ থাকা উচিত, তার সব কিছুই আব্বার কাছ থেকে শিখেছি। সর্বক্ষেত্রে মিথ্যা কথা থেকে বিরত থাকা, ওয়াদা রক্ষা করা, সময় অনুযায়ী চলা, সময়ের অপচয় না করা, মানুষের সাথে সব সময় ভালো আচরণ করা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে প্রায়ই তিনি আমাদের কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝাতেন। এগুলোর কোনো কিছুতে ভুল হলে খুবই রাগ করতেন। আব্বা গায়ে হাত দিয়ে খুব কমই শাসন করেছেন। চিৎকার করেও বকা দিতেন না। তখন ক্লাস এইটে পডি। আব্বা আমাকে তার চেম্বারে ডাকলেন একজন লোকের সাথে পরিচয় করানোর জন্য। সালাম বিনিময়ের পর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছ?' বললাম, 'ভালো।' আর কিছু না বলে যখন দাঁডিয়ে আছি, তখন আব্বা আমাকে কঠোর ভাষায় বললেন, একজন 'কেমন আছ' জানতে চাইলে তাকেও অনুরূপ প্রশ্ন করাটা খুবই জরুরি। এটি তোমার করা উচিত ছিল। কথাটি মনে রাখবে।' আজ পর্যন্ত এ ভদ্রতা প্রদর্শন করতে ভুলিনি।

ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলা পছন্দ করতাম। এ ব্যাপারে তিনি কখনো নিরুৎসাহিত করেননি। নিজেও ছাত্র অবস'ায় ভলিবল ও ব্যাডমিন্টন খুব ভালো খেলতেন। স্কুলজীবন থেকে স্কাউটিং করতেন। তবে খেলা দেখে সময় নষ্ট করাকে অপছন্দ করতেন। বলতেন, 'জীবনকে শুধু খেলা হিসেবে নেবে না। আল্লাহর কাছে কী জবাব দেবে?'

আমার পডাশোনা নিয়ে আম্মার চিন্তার শেষ ছিল না। আব্বা সব সময় বলতেন, 'নিজের ভালোটা নিজেকেই বুঝতে হবে। পডাশোনা কতটুকু করছ, তার দাযত্বি তোমার। আমি শুধু রেজাল্ট দেখব'। আব্বা-আম্মার বড শখ ছিল, তাদের একটি ছেলে অন্তত ডাক্তার হোক। বিভিন্ন কারণে আমার বড পাঁচ ভাইয়ের কেউ যখন ডাক্তার হলেন না, আমার ওপরই তারা ভরসা করতে শুরু করলেন। নিজেকে সে হিসেবে তৈরি করতে সচেষ্ট হলাম। কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট পডার সময়ই বুঝতে পারলাম যে, আমার দ্বারা ডাক্তারি পডা হবে না।

আব্বা এক দিন বললেন, 'মেডিক্যালে না পডলে কী পডতে চাও?'

'ইংরেজি'।

'সেটা তো খুব ভালো সাবজেক্ট। এ কথা আগে বলোনি কেন?'

কোনো বকা নয়, কোনো রাগ নয়, কী সুন্দরভাবে তিনি আমার বুকের ওপর থেকে বিরাট বোঝা তুলে নিলেন! তিনি আমার ইচ্ছার কথা চিন্তা করে তার দীর্ঘ দিনের স্বপ্নকে হাসিমুখে ভুলে গেলেন। সন্তানের জন্য নিজের আকাঙ্ক্ষাকে মুহূত্বের মধ্যে কোরবানি দিয়ে দিলেন। যখন পিএইচডি শেষ করলাম, তখন আব্বা-আম্মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম 'ডাক্তার' না হয়ে 'ডক্টর' হওয়ায় তাদের কেমন লাগছে? তাদের গর্বিত হাসি ছিল আমার প্রশ্নের উত্তর।

এমন একজন বাবা থাকলে কার না গর্বে বুক ফুলে যায়? অথচ তার নামের কারণেই আমার শিক্ষা ও পেশাজীবন দু'টিই বারবার ব্যাহত হয়েছে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে তার সন্তান হওয়ার 'অপরাধে' কোনো স্কুল আমাকে ভর্তি করতে রাজি হলো না। একটি বছর হারিয়ে গেল জীবন থেকে। ইন্টারমিডিয়েটের পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হলাম। এক বছর য়েত না য়েতই ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী এক ছাত্র সংগঠনের মারামারির জের ধরে ভিকটিম হতে হলো আমাকে। আমার 'অপরাধ' তো অনেক বড, আমার বাবার নামের কারণে। ফলে আমাকে ভার্সিটিতে য়েত দেয়া হলো না। আরো দু'টি বছর নষ্ট হয়ে গেল।

সবশেষে ভারতের আলীগডে গিয়ে পডাশোনা করতে হলো। নিজের দেশে পদে পদে বাধার সম্মুখীন হলেও ভারতে নির্বিঘ্নে পডাশোনা করতে পেরেছি। ভারতীয় আধিপত্যের আশঙ্কা করে আব্বা স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন না, সে দেশে শিক্ষাজীবনের সেরা সময়টি কাটিয়েছি। তাদের পররাষ্ট্রনীতি যা-ই হোক না কেন, কেউ যদি তাদের দেশে পডাশোনা করতে আসে এবং তাদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে, তারা তাকে সে সুযোগটি দেয়। অথচ আমাদের দেশে এ মৌলিক মানবাধিকারটুকুও নেই। এ জন্যই ভারতের গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে আর আমাদের গণতন্ত্র বারবার পডছে মুখ থুবডে।

২০০৫ সালের মার্চে ইংল্যান্ড থেকে একটি পোস্ট ডক্টরেট করে দেশে ফিরলাম। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করতাম, তারা এ জন্য ছুটি না দেয়ায় চাকরি ছেডেই য়েত হয়েছিল। কিন্তু দেশে এসে কোনো চাকরি পাচ্ছিলাম না। কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্পর্ধা' নেই গোলাম আয়েমর ছেলেকে চাকরি দেয়ার- তা সে বিখ্যাত আলীগড মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরাবর প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত হলেও না। ডক্টরেট ও পোস্ট ডক্টরেট করলেও এ 'অধিকার' আমার নেই। সুতরাং এমএ পাস করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই চাকরি করেছি, পিএইচডির পরও। কিন্তু পোস্ট ডক্টরেট করে এসে দেখি, আমার জন্য চাকরি নেই। একটি বড প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ইন্টারভিউতে ডাকল। কিন্তু নিলো না। কারণ? আমার নাকি য়েথষ্ট পাবলিকেশন নেই। অথচ সে সময় তিনটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান থেকে আমার পাবলিকেশনের নিশ্চয়তা দেয়া চিঠি ছিল যার মধ্যে একটি ইংল্যান্ডের। যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট ডক্টরেট করেছি, তাদের পক্ষ থেকে চিঠি দেয়, তারা আমার গবেষণাপত্রটি পাবলিশ করবে। বাংলাদেশের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে কয়জন গবেষণা করে? সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও বা কতটুকু রিসার্চ হয়? আর আমার যদি পাবলিকেশন্স নাই থাকত, তাহলে আজ কিভাবে ইংল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছি? চক্ষুলজ্জার কারণে সে প্রাইভেট ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ বলেনি যে, গোলাম আয়েমর ছেলেকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

শুধু আমিই এসবের সম্মুখীন হইনি। আমার যে ভাই সেনাবাহিনীতে ৩০ বছর চাকরি করলেন নিজের সব মেধা ও শ্রম দিয়ে, তার সাথে কি আচরণ করা হলো? তা তো আরো অনেক বেশি ভয়াবহ। তিনি সেনাবাহিনীর প্রায় সব পরীক্ষাতেই প্রথম হয়েছেন। বিএমএ থেকে সেরা ক্যাডেট হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন এবং সেনাবাহিনীর গোল্ড মেডেল পেয়েছেন। যারা তার সাথে চাকরি করেছেন বা তার সম্পর্কে জানেন, তারা সবাই বলবেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সর্বকালের সেরা অফিসারদের মধ্যে তিনি একজন। শুধু গোলাম আয়েমর সন্তান হওয়ার কারণে কোনো কারণ না দেখিয়েই তাকে বরখাস্ত করা হলো। যে প্রতিষ্ঠানের জন্য নিজের জীবনকে উজাড করে দিলেন, তাকে ন্যূনতম পাওনাগুলোও না দিয়ে সেখান থেকে বিদায় করা হলো। এ কেমন ন্যায়বিচার?

ইংল্যান্ড থেকে দেশে যাওয়ার আগে ঐরমযষু ঝশরষষবফ গরমৎধহঃ চৎড়মৎধসসব নামের একটি স্কিমে ইমিগ্রেশনের আবেদন করেছিলাম। যখন চাকরি পাচ্ছিলাম না তখন জানতে পারলাম, আমার আবেদনটি গৃহীত হয়েছে। অনার্স ও মাস্টার্সে ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্টের পর অনেকেই পরামর্শ দিয়েছিল ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় পিএইচডির জন্য য়েত। কিন্তু বুডো বাবা- মায়ের সাথে আমার কোনো ভাই না থাকায় আমাকে দেশে থেকেই আলীগডে প্রতি বছর দু-তিনবার যাওয়া-আসা করে পিএইচডি করতে হলো। যখন পোস্ট ডক্টরেটের পর চাকরি পাচ্ছিলাম না আর ইংল্যান্ডের ইমিগ্রেশন হয়ে গেল, তখন আব্বাই বললেন সেখানে চলে য়েত। কাগজপত্র জোগাড করে পাঠানোর পর অপেক্ষার পালা। কিন্তু ব্রিটিশ হাইকমিশন থেকে ভিসার কোনো খবর আসছে না। আমার ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে ২৮ বছর পর ইংল্যান্ডে আমাদের পুরো পরিবার একত্র হওয়ার সুযোগ হলো। আব্বা-আম্মা ও আমার চতুর্থ ভাই পরিবারসহ একসাথে ইংল্যান্ড যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক হয়ে আছে। কিন্তু আমার কী হবে? আব্বা ঘোষণা করলেন, 'আমার ভিসা না হলে তিনিও যাবেন না'। সন্তানের জন্য কী অপূর্ব মায়া! এক দিন সকালে ব্রিটিশ হাইকমিশন ফোন করে জানাল, তারা আমাকে ভিসা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাই যেন আমার পরিবারের সবার পাসপোর্ট নিয়ে দেখা করি। সাথে সাথে আব্বাকে খবরটি জানালাম। তিনি আনন্দে কেঁদে উঠে বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, আজকেই তাহাজ্জুদ পডে আল্লাহকে বলেছিলাম, আজই যেন তিনি একটি ভালো খবর দেন।' পরে আম্মার কাছে শুনেছিলাম, আব্বা সেদিন তাহাজ্জুদ পডতে গিয়ে সিজদায় গিয়ে দীর্ঘ সময় ছিলেন, আম্মা জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেছিলেন, সে সিজদা নামাজের ছিল না; ছিল আমাকে নিয়ে দোয়া করার জন্য।' আল্লাহ কিভাবে বাবা-মায়ের দোয়া কবুল করেন তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ এ ঘটনা।

আজ ৮৯ বছর বয়সে স্নেহশীল বাবা কী অবস'ায় আছেন তা আল্লাহই ভালো বলতে পারবেন। প্রচলিত আদালতে ছেলের সাক্ষ্য কাউকে নির্দোষ প্রমাণে সহায়ক হয় না। আল্লাহর কোর্টে সব সত্য সাক্ষ্য গৃহীত হবে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তার মতো ভালো মানুষের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো করা হচ্ছে, তা ডাহা মিথ্যা। যে মিডিয়া ট্রায়ালের সম্মুখীন তিনি হয়েছেন, তা তার প্রতি অবিচার। যে মানুষটিকে এত কাছে থেকে এত বছর দেখলাম, তার বিরুদ্ধে এত জঘন্য মিথ্যাচার অত্যন্ত পীডাদায়ক। স্বাধীনতার আগে ৪৮ বছর এবং স্বাধীনতার পর ৪০ বছর যার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললেন না, সে ব্যক্তি যুদ্ধকালীন কয়টি মাস এত খারাপ হওয়ার কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? তার সংস্পর্শে অন্য যারা এসেছে, তারা বলুন তিনি কেমন মানুষ। পাডার লোকদের জিজ্ঞেস করুন, যে মসজিদে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পডনে সে মসজিদের মুসল্লিদের কাছ থেকে খবর নিন। আমাদের বাসার কাজের লোকদের সাথে কথা বলুন। যে ছেলেটির কাঁধে ভর দিয়ে তিনি চলাফেরা করতেন তার সেই খাদেমের কাছ থেকে জানুন, তিনি কেমন মানুষ।

এ দেশকে তিনি কতই না ভালোবেসেছেন। চাইলে তিনি অনেক আরাম-আয়েশে দিন কাটাতে পারতেন। নির্বাসিত জীবনে ব্রিটিশ বা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে বিশ্বদরবারে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত হতে পারতেন। কিন্তু প্রিয় জন্মভূমির প্রতি টান তাকে নিয়ে গেছে বাংলাদেশে। ২৩টি বছর কাটিয়েছেন নিজের মাতৃভূমিতে 'বিদেশী' হয়ে। নিজের দেশের কিছু মানুষের দ্বারাই বারবার মিথ্যা অপবাদের শিকার হয়েছেন, কিন্তু কখনো কারো বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করেননি। গ্রেফতারের আগে তার অনুসারী ও সমগ্র দেশবাসীকে তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে সরকারের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে বলেছেন দেশের সমস্যাগুলো নিয়ে, তাকে নিয়ে নয়।

১৯৭১ সালে আব্বার ভূমিকা কী ছিল, নিজে বই লিখে বিস্তারিতভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন। টেলিভিশনে তার সাক্ষাৎকার ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। কেউ কি তার সে বক্তব্যের জবাব দিতে পেরেছে? ৪০ বছর ধরে কেউ তার বিরুদ্ধে একটি থানায়ও মামলা করল না কেন? এর মধ্যে তো প্রায় ১২ বছর আওয়ামী লীগই ক্ষমতায় ছিল। তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে কিছু পত্রিকায় তার দেয়া বিবৃতি ব্যবহার করা হয়। কোথায় কখন তিনি নিরীহ মানুষকে হত্যা, মহিলাদের ধর্ষণের জন্য বিবৃতি দিয়েছেন? মাত্র একটি উদাহরণ তারা দেখাক। আরেকটি উদ্ভট অপবাদ চালু হয়েছে- তিনি নাকি বাংলাদেশ হওয়ার পর বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তান বানানোর জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কী আজগুবি কথা! পত্রিকার কাটিং তারা দেখাক, কখন কোথায় তিনি এমন ভূমিকা রেখেছেন। কোনো রাজনীতিক বা আইনজীবী অতি সাধারণ এসব প্রশ্নের জবাব দেবেন কি?

ন্যায়বিচার হলে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু ৮৯ বছর বয়সের একটি মানুষকে এভাবে জেলে পাঠানো কোন ন্যায়বিচার? তাকে জামিন দিলে কি বিচার করা যেত না? কেন অভিযুক্তদের সাংবিধানিক অধিকার সংশিষ্ট আইনে রাখা হয়নি? ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশন, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, মার্কিন প্রেসিডেন্টের যুদ্ধাপরাধসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ স্টিফেন র‌্যাপ- সবাই এ আইনকে সংশোধন করতে বলেছেন। কারণ এ আইন ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। সরকার কি পারত না সেসব পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস'া নিতে, যাতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়? কিন্তু তা করা হচ্ছে না কেন?

এবার মিডিয়া ট্রায়াল প্রসঙ্গ। বেশির ভাগ পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল এমনভাবে সংবাদ প্রচার করছে যে, রায় হয়ে গেছে। তারা কি জানেন না যে, তাদের পছন্দসই কোর্টেও এখনো রায় দেয়া হয়নি? অভিযোগ কেবল দাখিল করা হয়েছে। এরপর শুনানি হবে, তার পর রায়। কিন্তু প্রমাণের আগে কিভাবে মিডিয়া একজনকে 'যুদ্ধাপরাধী' হিসেবে অভিহিত করে? তারা তো দেখলেন, আব্বা টিভিতে যেসব কথা বলেছেন তার জবাব কেউ দিতে পারেনি। তার পরও তারা কেন উঠেপডে লেগেছে? অন্য সবার মতো তাদেরও অভিযোগ প্রমাণের আগে জানার উপায় নেই আসলে কোনটা সত্য। রাজনৈতিক আদর্শ বড, না সাংবাদিকতার নীতি বড? আর আওয়ামী নেতারা তো দিনক্ষণ ঠিক করে ঘোষণা দিচ্ছেন, কবে রায় কার্যকর হবে। তারা কিভাবে জানেন যে, কী রায় হবে? কোনো কোনো মন্ত্রী তো বিচার না করেই ফাঁসি দিয়ে দেয়ার কথা বলছেন। এ অবস'ায় ন্যায়বিচার হওয়ার পরিবেশ কতটুকু থাকে, সবার বিবেকের কাছেই এ প্রশ্ন রাখছি।

দেশের কত ভাগ মানুষ এ বিচারপ্রক্রিয়াকে সমর্থন দিচ্ছে? গত নির্বাচনে অর্ধেকের বেশি মানুষ তাদের ভোট দেয়নি। তারা কি এটা চাচ্ছে? নাকি চাচ্ছে, দেশের হাজারও সমস্যা সমাধানে সরকার দাযত্বি পালন করুক? সরকার কি সেটা করছে? মিডিয়া দেখলে তো মনে হবে, এ বিষয়টাই জাতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আসলেই কি দেশবাসী তা মনে করে, নাকি তারা চায় অন্ন, বস্ত্র, বাস-স'ান, শিক্ষা, ন্যায়বিচারসহ মৌলিক অধিকার?

দেশবাসীর কাছে মজলুম ব্যক্তির সন্তান হিসেবে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই। সরকারকে আপনারাই তো ক্ষমতায় বসিয়েছেন। তাদের দাযত্বি আপনাদের কথা শোনা। আপনাদের কি তাদের কাছে ন্যায়বিচার চাওয়া উচিত নয়?

পরিবার হিসেবে আমরা আব্বাকে ভালোবাসি, তাই বৃদ্ধাবস'ায় তার স্বাস'্য নিয়ে আমরা চিন্তিত। কিন্তু আমরা ভীত নই। আব্বাকে কোনো দিন দেখিনি আল্লাহ ছাডা কাউকে ভয় পেতে। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি সবসময় আল্লাহর ওপরই আস'া রেখেছেন। সব জুলুম সহ্য করার জন্য তিনি প্রস'ত। তাকে অন্যায়ভাবে ফাঁসি দিলেও তিনি বিচলিত নন। কারণ শাহাদতের মৃত্যুকে তিনি সৌভাগ্যের বিষয় মনে করেন। আব্বাকে ভালোবাসি বলে তার জন্য মনটা কাঁদে। এ কথা যেমন ঠিক, তেমনি এ কথাও আমাদের স্মরণে আছে যে, তিনি আল্লাহর একজন খাঁটি বান্দা হিসেবে আল্লাহর হেফাজতেই থাকবেন। আল্লাহ যা ফায়সালা করবেন তা মেনে নিতে আমরা প্রস'ত। আব্বা সব সময় সহনশীলতার শিক্ষাই আমাদের দিয়ে গেছেন। তাই যারা এত সব অন্যায় করছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা বিদ্বেষ পোষণ করি না। তাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদের হেদায়েত করেন। আর তারা যদি হেদায়েতের যোগ্য না নয়, তবে তাদের ক্ষতি থেকে আমাদের প্রিয় জন্মভূমির মানুষদের যেন তিনি মুক্ত করেন। কিন্তু যে অন্যায় এ সরকার আমার বাবা ও তার সহকর্মীদের সাথে করছে, তা মেনে নেয়া যায় না।

হে পরোয়ারদিগার, তুমি প্রকাশ্য ও গোপন সব কিছু জানো। আমরা জানি তোমার কোর্টে শতভাগ ন্যায়বিচার হয়। আমরা আব্বাকে তোমার কাছে সোপর্দ করলাম ও তোমার ন্যায়বিচার দেখার অপেক্ষায় থাকলাম। যে অন্যায় অপবাদের দ্বারা তোমার এ বান্দা জর্জরিত, তা থেকে তুমি তাকে মুক্ত করো। সব জুলুম থেকে তুমি তাকে রক্ষা করো। আর আসল সত্য কী, তা তুমি সবার কাছে উন্মোচিত করো- আমিন!